মধ্যযুগে বাংলার অর্থনীতি
(১২০৪-১৭৫৭)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মধ্যযুগের বাংলার আর্থিক বিষয়ে গ্রন্থ বা গবেষণা অপ্রতুল। এ যুগের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিলে এর যথার্থতা স্পষ্ট বোঝা যায়। বাংলার মধ্যযুগের আর্থিক অবস্থা বিষয়ে যেসব গবেষণা বা গ্রন্থ পাওয়া যায় সেগুলোর বেশির ভাগ বিচ্ছিন্ন, নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক ও আংশিক। সেদিক থেকে এ গ্রন্থে মধ্যযুগের বাংলার আর্থিক চালচিত্রের বা অর্থনীতির পদ্ধতিভিত্তিক পর্যালোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। মূলত এ গ্রন্থটি আমার পোস্ট-ডক্টরাল গবেষণা ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে রচিত। তাই পোস্ট-ডক্টরাল গবেষণার পুরো প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলের বিশেষ করে ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজের (আইবিএস) অধ্যাপক মোহাম্মদ নাজিমুল হক, অধ্যাপক স্বরোচিষ সরকার, অধ্যাপক মো. কামরুজ্জামানসহ সকলের সার্বিক সহযোগিতার জন্য তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আইবিএস-এর গবেষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ বিশেষ করে গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ পুরো সময় সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের ঋণ শোধ করার নয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকবৃন্দ বিশেষ করে অধ্যাপক গোলাম সাব্বির সাত্তার, অধ্যাপক আবুল কাশেম, অধ্যাপক গোলাম কবির ও আরও অনেকেই আমাকে যেভাবে সহযোগিতা করেছেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার জানা নেই। ইমেরিটাস অধ্যাপক আন্না রিয়েন দূরদেশের হয়েও যে পরিমাণ সহযোগিতা ও মানসিক শক্তি জুগিয়েছেন তা অতুলনীয়। যদিও কাজটি দুই বছরের জন্য পরিকল্পিত ছিল কিন্তু নির্দেশনা অনুযায়ী এক বছরের

মধ্যে সমাপ্ত করতে হয়েছে। এই পুরো সময় আমার স্ত্রী ওয়াহিদা খানম যেভাবে সাহায্য করেছেন ও পাশে থেকেছেন তার তুলনা হয় না। সাদিক, অনি, তাসিন, স্বরূপ, স্বনন, নিরব ও ফাহাদ ল্যাপটপ ও অন্যান্য কারিগরি সমস্যা সমাধানে তৎপর ছিল। তাদের প্রতি আমার ভালোবাসা। এ তালিকা আরও দীর্ঘ। তাই শ্রদ্ধাভাজন, আপনজন, স্নেহভাজনদের অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। আমার এসব কাজ করার জন্য অনেকেই বিরক্ত। তাঁদের প্রতিও নিরন্তর ভালোবাসা। কথাপ্রকাশ পাঠকদের জন্য বইটি প্রকাশ করতে আগ্রহী। তাঁদের এ আগ্রহকে সম্মান জানাই। কাজ করতে গিয়ে ভুল হবেই তাই নির্ভুলতার অশেষ কাজে সবাইকে সহযোগিতার অনুরোধ। আগামীতেও সকল কাজে সবার সহযোগিতা কামনা করছি।

সাদিকুর রহমান
রাজশাহী
০৫ নভেম্বর ২০২৪

সূচি

ভূমিকা ১১

প্রথম অধ্যায়
মধ্যযুগে বাংলার রাজনীতি ৩৫

দ্বিতীয় অধ্যায়
মধ্যযুগে বাংলার কৃষি ১০২

তৃতীয় অধ্যায়
মধ্যযুগে বাংলার শিল্প ১৮০

চতুর্থ অধ্যায়
মধ্যযুগে বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য ২৪০

পঞ্চম অধ্যায়
মধ্যযুগে বাংলার জীবনযাত্রার মান ৩১৮

উপসংহার ৩৬৬

পরিশিষ্ট
উপাদান বা সাহিত্য পর্যালোচনা ৩৭৯
গবেষণা পদ্ধতি ৩৯৩

গ্রন্থপঞ্জি ৩৯৭
নির্ঘণ্ট ৪০৯

ভূমিকা

কোনো সমাজের কোনো কালপর্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সে সমাজের সেকালের আর্থিক জীবন ও কর্মকাণ্ড। মধ্যযুগের বাংলারও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবের দিক ছিল এর আর্থিক জীবন। এ যুগে বাংলার আর্থিক জীবন ও কর্মকাণ্ড প্রধান তিনটি উপায়—কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর নির্ভর করত।[১] অর্থাৎ সামাজিক সম্পদের বা উৎপাদনের কিংবা ধনসম্পদের ক্ষেত্রে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যই মধ্যযুগে বাংলার মূল উপায়। এ যুগে বাংলার কৃষি অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। মধ্যযুগের বাংলার মানুষ খুব পরিশ্রমী ছিল এবং চাহিদার অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদনের ক্ষমতা তারা রাখত।[২] কৃষির উদ্বৃত্ত ফলন ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সুলভ মূল্যের কারণে মধ্যযুগে বাংলা শিল্প উৎপাদনে উৎকর্ষ লাভ করে। শিল্পপণ্য বিশেষত বস্ত্রশিল্প কেন্দ্র হিসেবে মধ্যযুগের বাংলা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।[৩] কৃষি ও শিল্পপণ্যের ব্যবসা-বাণিজ্যেও বাংলার সুদৃঢ় অবস্থান লক্ষ করা যায়। এশিয়ার বাণিজ্য জগতে বাংলা সর্বোচ্চ স্থানে ছিল।[৪] বাংলার চাল, সুতিবস্ত্র, মসলিন, রেশম, চিনি, লঙ্কা, নীল প্রভৃতি এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রফতানি হতো।[৫] পুরো মধ্যযুগে সমগ্র বিশ্বের মানুষ বাংলার কৃষি ও শিল্পপণ্যের কথা শুনেছে ও সংগ্রহ করেছে।

বহির্বিশ্বে বাংলার পরিচয় ঘটেছে এর সাধারণ কৃষক ও কারিগরদের উৎপাদিত পণ্যে। যা প্রমাণ করে আর্থিক কর্মকাণ্ডে বাংলা ছিল প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ।[৬] সেজন্য মধ্যযুগে বহির্বিশ্বে বাংলার পরিচয় কোনো রাজবংশ কিংবা সমরনায়কের দ্বারা ঘটেনি, বরং আর্থিক কর্মকাণ্ডের জন্য বাংলা প্রসিদ্ধ ছিল। অথচ বাংলার মধ্যযুগের অধ্যয়নে রাজা বাদশাহদেরই প্রাধান্য। বাংলার আর্থিক অবস্থার অধ্যয়ন এখনো অবহেলিত। অবশ্য বাংলার অতীত সমাজ অধ্যয়নের ইতিহাসও খুব পুরানো নয়। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে বাংলা তথা ভারতের আর্থিক ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে অনুসন্ধান, পর্যালোচনা, গবেষণা ও গ্রন্থ রচনা শুরু হয়। তবে এসব গবেষণা, অনুসন্ধান বা পর্যালোচনার বেশির ভাগই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক বাংলার।

সাধারণভাবে বলা হয় যে, মধ্যযুগে বাংলার আর্থিক অবস্থার বিবরণ আশানুরূপভাবে লেখা হয়নি।[৭] হান্টার বলেন যে, বাংলার পূর্ণাঙ্গ সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার ইতিহাস নেই। অথচ উনিশ শতকের মধ্যপাদ হতে মানবিক তথ্য ও তত্ত্ব ব্যাখ্যায় এটি স্বীকৃত যে, মানুষের সমাজই মানুষের সব ধরনের কর্মকাণ্ডের উৎস এবং সেই সমাজের বিবর্তন-আবর্তনের ইতিহাসই মানুষের ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি নির্ণয় করে। কিন্তু বাংলাদেশে অতীত সমাজের অবস্থা অধ্যয়নে এই সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টি ও আলোচনা পদ্ধতি স্বীকৃতি লাভ করেনি।[৮] নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, পৃথিবীর সর্বত্র পণ্ডিত সমাজ স্বীকার করে যে, ধন বা সামাজিক উৎপাদনের প্রণালি ও বণ্টন ব্যবস্থার ওপরই বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন কালের বৃহত্তর সমাজ সংস্থান নির্ভর করে। বিভিন্ন শ্রেণি ও স্তর এই ব্যবস্থাকেই আশ্রয় করে গড়ে ওঠে।[৯] বস্তুত যে-কোনো কালের যে-কোনো সমাজের অবস্থার পর্যালোচনা ওই সমাজের বস্তুগত ভিত্তির ওপর নির্ভর করে এবং এর ওপর ভিত্তি করেই সমাজের অন্য সম্পর্কের আলোচনা করা যথার্থ। বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার এরূপ পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রে নীহাররঞ্জন রায় উপাদানের অপ্রতুলতার উল্লেখ করেছেন।[১০] মধ্যযুগের বাংলার আর্থিক অবস্থা পর্যালোচনায়

যথেষ্ট পরিমাণে উপাদান না থাকার ফলে ওই কালের আর্থিক ইতিহাসের রূপরেখা শুধু পাওয়া যায়।[১১] উপাদানের অপ্রতুলতার কারণ দেখিয়ে এই সমাজের অবস্থা পর্যালোচনার বস্তুগত ভিত্তিকে অস্বীকার করারও উপায় নেই। কেননা সমাজসৌধের বস্তুগত ভিত্তি হচ্ছে ধন। আর সে কারণেই নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, বাংলার ধন সম্বল কী ছিল, ধন উৎপাদনের কী কী উপায় ছিল, কী কী ছিল উৎপন্ন বস্তু, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য ইত্যাদি কীরূপ ছিল?[১২] এসবকে বাংলার সমাজ বিন্যাসের ভিত্তি হিসেবে ধরে নিয়ে সমাজের আর্থিক অবস্থা পর্যালোচনা করা আবশ্যক। এর আলোকে মধ্যযুগের বাংলাকে পর্যালোচনা করে একটি চিত্র তৈরি করতে পারলে সমকালীন সমাজের স্বরূপ বোঝা এবং প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা লাভ সম্ভব।

মানবসমাজের অবস্থার বিবরণ যাকে ইতিহাস বলা হয় তা যে শুধু 'রাজা-মহারাজার কীর্তি কাহিনি'—এরূপ ধারণার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। সমাজের বিবরণে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না তথা মানুষের বাস্তব কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা করার চেষ্টা করছে। সমাজের বিবরণে বা পর্যালোচনায় বর্তমানে তাই জোর দেওয়া হয় মানুষের সামাজিক ও আর্থিক জীবনের ওপর।[১৩] ইতিহাস মূলত মানবসমাজসমূহের জীবনবৃত্তান্তের দলিল বা বিবরণ।[১৪] এককথায় মানবসমাজের বিজ্ঞানসম্মত পাঠ।[১৫] বস্তুত যেসব বাস্তব অবস্থা বা বস্তুগত অবস্থা ওইসব সমাজের উন্নতির বা অগ্রগতির সহায়ক হয়েছে কিংবা তা ব্যাহত করেছে সেসবের বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনাই ইতিহাসের কাজ।[১৬] এ হচ্ছে মানবসমাজ ও সভ্যতার বিবরণ এবং সমাজের রূপের পরিবর্তনের কাহিনি।[১৭] এভাবেই মূলত ইতিহাসবিদ্যা হয়ে ওঠে ঐতিহাসিক সমাজবিদ্যা।[১৮] এ কারণেই মধ্যযুগে বাংলার সমাজ পর্যালোচনায় আর্থিক অবস্থার খুঁটিনাটি জানার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। আর সে কাজটি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ইতিহাস কাঠামোর মধ্যেই করার চেষ্টার কথাও বলা হয়, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নীহাররঞ্জন রায় সে কারণেই বঙ্কিমকে উদ্ধৃত করেন, 'বাঙালার ইতিহাস চাই।

নহিলে বাঙালি কখনও মানুষ হইবে না।'[১৯] অবশ্য বঙ্কিম যখন বাংলার ইতিহাসের কথা বলেন তখন তিনি এর আর্থ-সামাজিক অবস্থার পূর্ণাঙ্গ বিবরণের ওপরই জোর দেন। কারণ মানুষ তার পূর্ববর্তী সমাজ-সভ্যতার ওপর ভর করে বর্তমান পরিস্থিতির সাথে খাপ খেয়ে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হয়। অর্থাৎ বর্তমান ও অতীতের মধ্যকার এক অন্তহীন সংলাপের মাধ্যমে ভবিষ্যতের দিক অগ্রসর হওয়া।[২০] ইতিহাসের গুরুত্ব এই যে, তা সব যুগের মানুষের জীবন ও কর্মের সমগ্রতাকে ধারণ, গ্রহণ ও প্রকাশ করতে পারে।[২১] বস্তুত মানবসমাজের আজকের অবস্থা কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যাপার নয়। অতীতের বহু পরিবর্তনের ফলে বর্তমান সমাজ গড়ে উঠেছে। বর্তমান সমাজকে বুঝতে হলে অতীতের পর্যালোচনা ছাড়া সম্ভব নয়।[২২] কেননা মানুষের সমাজ এবং তার সামাজিক জীবনে পরিবর্তনই ইতিহাসের সারকথা। প্রয়োজনীয় সকল জিনিসের উৎপাদন এবং বণ্টনের আর্থিক ব্যবস্থাই এর মূলে থাকে।[২৩] অর্থাৎ একটি সমাজের মানুষের আর্থিক কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা হলো তার ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

মধ্যযুগের বাংলার আর্থিক অবস্থা ও বিকাশধারা বিষয়ে গবেষণা অপ্রতুল। এর কারণ উপাদান ও উপকরণের অপর্যাপ্ততা। কিন্তু এ সময়ের বাংলার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অবস্থাবিষয়ক আলোচনা বর্তমানে বেশ সমৃদ্ধ। তাই এই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক আলোচনার অবকাঠামোয় এ যুগের আর্থিক অবস্থা অনুসন্ধান করা যেতে পারে বলে অনেক গবেষক মতপ্রকাশ করেন।[২৪] যদিও কিছু সংখ্যক গবেষক মধ্যযুগের বাংলার আর্থিক অবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে কাজ করেছেন তথাপি তা প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। সে কারণে প্রবোধচন্দ্র সেন লেখেন যে, মধ্যযুগের ইতিহাসের এই অভাবটি পূর্ণ না হলে আমাদের ভাবী জাতীয় জীবনও সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা পেতে পারবে না।[২৫] কেননা মধ্যযুগের ভারতীয় তথা বাংলার সমাজ বিষয়ে যথাযথ পর্যালোচনার অভাবের ফলে 'পরিবর্তনহীন সমাজের ধারণা'; 'অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে এদেশের মানুষের অপার্থিবতার প্রতি

ঝোঁক'; 'জাতিবর্ণ বিভক্ত সমাজের অনমনীয় চরিত্রের ধারণা', 'প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরতন্ত্রের তত্ত্ব', 'স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজ'; 'জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অনুপস্থিতি' প্রভৃতি ধারণাগুলোর সত্য-মিথ্যা জানা সম্ভব হয় না।[২৬] যদিও ভারত তথা বাংলায় মধ্যযুগে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তঃসম্পর্কিত পরিবর্তন লক্ষণীয়। সেগুলো হলো : ক. শহরের আয়তন ও তার সংখ্যার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি, খ. হস্ত ও কুটিরশিল্পের উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য বিস্তার এবং গ. তার সঙ্গে মানানসই বাণিজ্যের প্রসার।[২৭] মূলত মধ্যযুগের বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থায় কতকগুলো সামন্ততান্ত্রিক উপাদান স্পষ্ট থাকলেও এর অর্থনীতির সার্বিকতায় নগরায়ণ ও বাণিজ্যের ভূমিকাও প্রবল ছিল।[২৮] অথচ তথ্য ও উপাদানের অপর্যাপ্ততার কারণে গবেষকরা আধুনিক বাংলার সার্বিক আর্থিক অবস্থা পর্যালোচনায় যতটা আগ্রহী মধ্যযুগ সম্পর্কে ততটা নয়।[২৯] অথচ সর্বজনস্বীকৃত বিষয় হলো, আর্থিক উন্নয়ন যে-কোনো দেশের ইতিহাসের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল।[৩০] কারণ অর্থনীতির বিবেচ্য বিষয় মূলত ইতিহাসের ওপর নির্ভরশীল একটি ঘটনা বিন্যাস। ঐতিহাসিক অনুভূতি ছাড়া বর্তমান যুগের অর্থনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ বোঝা সম্ভব নয়।[৩১] সে কারণে দেশের উন্নয়নের জন্য এর আর্থিক অবস্থা নিয়ে গবেষণা তথা এই দেশের অতীতকালের আর্থিক অবস্থার পর্যালোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আর্থিক অবস্থার বিবরণ যে-কোনো জাতির ইতিহাসের একটি প্রধানতম বিষয়। কেননা 'মানুষকে ইতিহাস তৈরি করতে হলে অবশ্যই বেঁচে থাকার অবস্থায় থাকতে হবে। সব কিছুর আগে জীবনের জন্য প্রয়োজন খাবার, পানি, বাসস্থান, কাপড়চোপড় আরও অনেক কিছু। তাই প্রথম ঐতিহাসিক কাজটি হচ্ছে এই প্রয়োজনগুলো মেটাবার উপায় তৈরি করা—খোদ বস্তুগত জীবনের উৎপাদন। এটা আসলেও একটা ঐতিহাসিক কাজ, সমস্ত ইতিহাসের এক বুনিয়াদি শর্ত। আজ যেমন হাজার বছর আগে থেকেও তেমনি প্রতিদিন প্রতিঘণ্টা এই প্রয়োজন পূর্ণ করতে হচ্ছে নিছক মানবজীবন টিকিয়ে রাখতে।'[৩২]

অর্থাৎ যে-কোনো কালের যে-কোনো জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে যেসব আর্থিক বা বস্তুগত বুনিয়াদ বা বিষয় সেসবের পর্যালোচনা সে জাতির সে সময়ের ইতিহাসের প্রধানতম অংশ। কিন্তু মানুষের আর্থিক অবস্থার বিবরণ বা পর্যালোচনার জন্য প্রাপ্ত উপকরণ সাধারণ ইতিহাস অপেক্ষা অনেক কম।[৩৩] এর কারণ হলো অতীত হতে যে সামান্য প্রমাণ সংগ্রহ করা যায় তা রাজকাহিনি, যুদ্ধ, পুরাকীর্তি আর অসাধারণ ঘটনার স্মৃতি বিজড়িত। মানুষের আর্থিক জীবন খুব গুরুত্বপূর্ণ হলেও উদ্ধারকৃত পুরাকীর্তি হতে সে বিষয়ে জানার তেমন কোনো উপায় থাকে না। বাংলার মধ্যযুগের আর্থিক জীবন সম্পর্কেও এ কথা সত্য। অর্থাৎ প্রাপ্ত ইতিহাসের উপাদান এ যুগের মানুষের আর্থিক অবস্থা জিজ্ঞাসার অল্পই পরিতৃপ্ত করতে সক্ষম। তবে গবেষণার বহুমাত্রিক পদ্ধতির প্রচলনের কারণে উক্ত যুগের আর্থিক অবস্থার পর্যালোচনা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়।[৩৪] আব্দুল্লাহ ফারুক লিখেছেন যে, 'বাংলাদেশের কোনো কোনো বিশেষ যুগ বা সময়ের আর্থিক অবস্থার ওপর এক-আধখানা গবেষণা গ্রন্থ হয়তো রচিত হয়েছে। কিন্তু আদিকাল হতে শুরু করে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ কীভাবে চলছে, তার একটি উচ্ছ্বাস বিবর্জিত প্রামাণ্যগ্রন্থ আজও ইংরেজি বা বাংলা কোনো ভাষাতেই রচিত হয়নি।'[৩৫] সে কারণে তিনি বলেন—'রাজকাহিনি, সামাজিক ইতিহাস, বিজ্ঞানের ইতিহাস, সাহিত্যের ইতিহাস, যুদ্ধের ইতিহাস ইত্যাদির একটি অংশ হিসেবে বাংলার আর্থিক ইতিহাস আলোচনা করা যেতে পারে।'[৩৬] অর্থাৎ বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের অবকাঠামোয় এদেশের আর্থিক অবস্থা পর্যালোচনা করা সম্ভব। কেননা প্রাচীনকাল কিংবা মধ্যযুগেও কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য বাংলার আর্থিক জীবনের প্রধান উপায়। সেই সূত্রে মধ্যযুগে বাংলার মানুষ কী উপায়ে তার আর্থিক প্রয়োজন মেটাত, কী কী দ্রব্য উৎপন্ন করত, কী কৌশলে দ্রব্য বিনিময় করত, কী উপায়ে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে বণ্টন হতো এবং মানুষের জীবনযাত্রার মানের কী অবস্থা ছিল ইত্যাদি প্রশ্নের অনুসন্ধান প্রয়োজন। এক কথায় মধ্যযুগে